International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-X, Issue-V, September 2024, Page No.80-89
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v10.i5.2024.80-89

ভারতীয় দর্শনে শব্দালোচনা : একটি সমীক্ষা

মৈত্রী গোস্বামী
গবেষক, দর্শন বিভাগ, কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়, আসানসোল, পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:
The discussion regarding śabda in Indian Philsophy is fundamental. We can see that the schools of Indian philosophy dealt a lot to explore the nature of śabda from different point of view. They have tried to highlight different aspects of śabda and taken part in various debates to focus the actual nature of śabda from different angle. The Indian philosophers have dealt a lot regarding the metaphysical aspect of śabda which includes the debate regarding its eternity or non-eternity, the epistemological aspect of śabda which includes the discussion regarding its capacity to generate knowledge separately and the linguistic aspect of śabda which includes the explanation regarding its uses in the sentences as an important part or material of verbal communication. In this short research article, I have tried to touch the deep discussion regarding the above-mentioned nature of śabda and tried to explore the queries regarding different aspects of śabda from an analytical manner.
Keywords: নিত্যতা, অনিত্যতা, দ্রব্যত্ব, গুণত্ব, প্রমাণ, ভাষাদর্শন, পদ-পদার্থ সম্বন্ধ।

শব্দকেন্দ্রিক নানা জিজ্ঞাসা শব্দচর্চাকে যেমন সমৃদ্ধ করেছে, তেমনই শব্দচর্চার ধারা যে ভারতীয় দর্শনে যে একরৈখিক বা একমুখী নয়, সেকথাও প্রতিষ্ঠা করেছে। সাধারণ মানুষ দৈনন্দিন জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য নানা রকম শব্দের ব্যবহার করে থাকেন, যদিও ব্যবহৃত শব্দগুলির স্বরূপ কেমন, কীভাবে তার উৎপত্তি হয়েছে, শব্দের জ্ঞানোৎপাদন সামর্থ্য আছে কি না, কীভাবে এই শব্দগুলি ভিন্ন ভিন্ন অর্থকে নির্দেশ করে- শব্দকেন্দ্রিক এই জিজ্ঞাসাগুলি সাধারণ মানুষকে খুব বেশি ভাবিত করেনা। তবে শব্দকেন্দ্রিক এই জিজ্ঞাসাগুলি সর্বদায় ভারতীয় দর্শনচর্চার রসদ জুগিয়েছে। মূলতঃ শব্দকেন্দ্রিক এই জিজ্ঞাসাগুলি ভারতীয় দর্শনে তিন দিক থেকে আলোচিত হয়েছে। যেমন শব্দ সম্পর্কিত আলোচনায় শব্দের উৎপত্তি, বিনাশ, শব্দের দ্রব্যত্ব বা গুণত্ব প্রতিষ্ঠাবিষয়ক আলোচনা শব্দ সম্পর্কিত আধিবিদ্যক আলোচনার সূত্রপাত ঘটায়, শব্দের জ্ঞানোৎপাদন সামর্থ্য আছে কি না, যে শব্দ জ্ঞানোৎপাদনের সমর্থ সেই শব্দটির স্বরূপ কেমন, ইত্যাদি আলোচনা জ্ঞানতাত্ত্বিক ব্যাখ্যার সঙ্গে যুক্ত, আবার শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে অর্থাৎ ভাব বিনিময়ের বাহকরূপে বাক্যের অমূল্য উপাদান হিসাবে যে শব্দকে আমরা পায় তা কি শুধুই পদ সমষ্টি, সুশৃঙ্খলভাবে বিন্যস্ত কতকগুলি অক্ষরের সমাহারমাত্র, নাকি পদ-পদাংশ হয়ে পদ-পদার্থযুক্ত হয়ে কীভাবে ভাবের বাহকরূপে পূর্ণ বাক্য হয়ে ওঠে ইত্যাদি আলোচনা শব্দের ভাষাতাত্ত্বিক দিকটিকেই সূচীত করে। তাই বলা যেতে পারে

শব্দ সম্পর্কিত আলোচনা ভারতীয় দর্শনে যেমন একরৈখিক বা একমুখী নয়, তেমনই কোনো 'নির্দিষ্ট কেন্দ্রীকৃত শব্দ' শব্দচর্চার আলোচ্য বিষয় নয়। এপ্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে, ভারতীয় দর্শনালোচনার পরিসরে শব্দতত্ত্ব আলোচনার পরিধিতে প্রবেশ করলে শব্দ যে বহুরূপ ও বহুমুখ নিয়ে আলোচনার দাবী রাখে সেকথাই সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধটি শব্দ সম্পর্কিত বহুরূপী ও বহুমুখী শব্দতত্ত্ব সম্পর্কিত একটি বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা। এই আলোচনার ধারাকে সুবিন্যস্তভাবে আলোচনা করার তাগিদে প্রথমে ঋক্‌বৈদিক যুগের শব্দচর্চা আলোচনার ধারাকে অনুসরণ করে এই আলোচনা অগ্রসর হয়েছে। ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন সম্প্রদায় শব্দচর্চা বিষয়ক আলোচনাকে যেভাবে গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করেছেন তার থেকে একথা প্রমাণিত হয় যে, শব্দচর্চা বিষয়ক আলোচনা বহুমুখী ও বহুরূপে বিধৃত, অর্থাৎ বহুরূপী। বর্তমান প্রবন্ধে বহুরূপে বিধৃত এই শব্দচর্চা ঋক্‌বৈদিক যুগের শব্দচর্চার হাত ধরেই ভারতীয় দর্শন পরম্পরার আলোকে আলোচিত হয়েছে।

ঋক-বৈদিক যুগে শব্দচর্চাঃ ঋগ্বেদের বাক্‌সূক্তে অম্ভৃণ নামক ঋষির কন্যা বাক্'এর পরিচয় আমরা পাই। ঋগ্বেদে উল্লেখ আছে তিনি সচ্চিদানন্দ স্বরূপ পরমাত্মার সঙ্গে অভিন্নতা উপলব্ধি করে বলেছিলেন,

> "অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরাম্যহমাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ।
> অহং মিত্রাবরুণোভা বিভর্ম্যহমিন্দ্রাগ্নী অহমশ্বিনোভা"।[1]

অর্থাৎ, আমি (বাক্) রুদ্র, বসু, আদিত্য এবং বিশ্বদেবগণরূপে বিচরণ করি। মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র, অগ্নি, এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে আমি ধারণ করি। বাক্‌সূক্তে যেভাবে বাক্' এর মহাত্ম্যকে তুলে ধরা হয়েছে তাতে এটি স্পষ্ট হয় যে বাক্‌ই হল আদি যা এই বিশ্বচরাচরকে পরিচালিত করছে।

ঋক্‌বেদে বাক্-এর চারটি রূপের কথা বলা হয়েছে। এই চারটি বাক্ এর প্রথম তিনটি অব্যক্ত এবং চতুর্থটি ব্যক্ত। এই ব্যক্ত রূপটিকেই সাধারণ মানুষ বলা ও বোঝার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করতে পারে। বাক্-এর অব্যক্ত তিনটিরূপের সূক্ষতম, সূক্ষতর, সূক্ষ এই তিন ভাবেও পরিচয় পাওয়া যায়। যা পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা নামে ব্যাকরণ দর্শনে অভিহিত হয়েছে, আর বৈখরী নামে অপর একটি রূপ যা ব্যক্ত তা বাক্‌তত্ত্বের প্রকাশিত অবস্থা। শব্দ সূক্ষ অবস্থায় প্রাণীর মূলাধারচক্রে বিদ্যমান থাকে এবং দেহের অভ্যন্তরস্থ প্রাণবায়ু দ্বারা মূলাধার চক্রে অবস্থিত সূক্ষতম শব্দকে উর্দ্ধে প্রেরিত করে। মূলাধার চক্রে অবস্থিত সূক্ষতম শব্দ যা 'পরা' নামে অভিহিত হয় তা প্রাণবায়ুর দ্বারা উত্থিত হয়ে নাভিদেশ প্রাপ্ত হয়। সূক্ষতম থেকে সূক্ষতর অবস্থা প্রাপ্ত বাক্ পশ্যন্তী নামে পরিচিত। তারপর সেই বাক্ বায়ু দ্বারা পরিচালিত হয়ে উর্দ্ধদিকে উঠে সূক্ষতর থেকে সূক্ষ অবস্থা প্রাপ্ত হয় যা মধ্যমা নামে অভিহিত হয়। এই মধ্যমা বাক্ কণ্ঠদেশ প্রাপ্ত হয়ে স্থূল রূপ প্রাপ্ত হয় এবং তখন তা বৈখরী নামে অভিহিত হয়। এই বৈখরী বাক্ স্থূল অবস্থা প্রাপ্ত হলে তা শ্রবণগোচর হয়। ঋক্ বৈদিক যুগের এই বাক্‌চর্চা শব্দ বা বাক্-এর স্বরূপ ব্যক্ত করার মধ্য দিয়ে শব্দালোচনার ধারাকে একটি বিশেষ মাত্রা প্রদান করেছে।

এপ্রসঙ্গে বলা যেতে পারে বাক্ বা শব্দের রূপতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দেওয়ার কাজটি সম্পন্ন করে ব্যাকরণ। শব্দের উপকরণ হিসাবে প্রকৃতি ও প্রত্যয় চিহ্নিত করে ব্যাকরণে শব্দচর্চার ধারা এগিয়েছে। বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণের ক্ষেত্রে ব্যাকরণের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তাই ব্যাকরণকে বেদের মুখ বলা হয়ে থাকে।

---

[1] ঋগ্বেদ ১০। ১২৫।১।, শব্দার্থ সম্বন্ধ সমীক্ষা, গঙ্গাধর কর ন্যায়াচার্য থেকে সংগৃহীত পৃষ্ঠা ১৮।

এপ্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে ব্যাকরণশাস্ত্রের মতো যাস্কের নিরুক্তশাস্ত্রেরও শব্দচর্চার ক্ষেত্রে ভূমিকা অপরিসীম। নিরুক্তশাস্ত্রের মূল উদ্দেশ্য হল শব্দার্থের সন্ধানে শব্দের অবয়ব নিরূপণ করে তার অর্থ নির্ধারণ।

ভারতীয় দর্শন পরম্পরায় শব্দচর্চা: ভারতীয় দর্শন পরপম্পরায় শব্দচর্চার যে ধারা পরিলক্ষিত হয় সেখানে ঋগ্বেদ ও ব্যাকরণ শাস্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রয়েছে। পশুপাখির কল-কাকলি, নদীর কলকল শব্দ, ঢাকঢোল মৃদঙ্গাদির শব্দ, বহুবিধ যানবাহনের হর্ণ এগুলির শ্রাবণ প্রত্যক্ষ হলেও তা 'আওয়াজ' মাত্র। দার্শনিক পরিভাষায় এই 'আওয়াজ' ধ্বন্যাত্মক শব্দ নামে অভিহিত হয়। এপ্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে শব্দ শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রাহ্য হয় এবং ভাব বিনিময়ের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে পরিগণিত হয় সেই শব্দ নানাভাবে দার্শনিক পরিভাষা প্রাপ্ত হয়। ভাব বিনিময়ে বক্তার উচ্চারিত শব্দ যা শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ হয় সেই শব্দই দার্শনিকগণের প্রধান আলোচ্য বিষয়। তবে গ্রন্থপাঠ বা লিপির মাধ্যমেও আমাদের শব্দজ্ঞান হয়। আবার বেদনির্ভর ভারতীয় দর্শন অনুযায়ী বেদ শব্দপ্রমাণ। সেক্ষেত্রে বৈদিক চিন্তাধারায় শব্দের ভূমিকা অপরিসীম।

ভারতীয় দর্শনে শব্দ উৎপত্তি-বিনাশ যুক্ত না উৎপত্তি-বিনাশযুক্ত নয় সে বিষয়ে একটি বিতর্কিত আলোচনা পরিলক্ষিত হয়। এই আলোচনা প্রধানত শব্দ কেন্দ্রিক আধিবিদ্যক আলোচনার পরিসরভূক্ত। ভারতীয় দর্শনে শব্দ দ্রব্য না গুণরূপে দ্রব্যে আশ্রিত এই প্রশ্নটিও শব্দচর্চাবিষয়ক আধিবিদ্যক আলোচনার আরেকটি ধারাকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। বলা যেতে পারে এই আলোচনাকে কেন্দ্র করেও ভারতীয় দর্শনে ন্যায়-বৈশেষিক ও মীমাংসা দর্শনের মধ্যে মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

ভারতীয় দর্শনে শব্দচর্চার অন্যতম দিকটি হল প্রমাণরূপে শব্দের আলোচনা। এই আলোচনার মুখ্য দিকটি শব্দের জ্ঞানোৎপাদন সামর্থ্য বিষয়টিকে কেন্দ্র করে আলোচিত হয়েছে। ভারতীয় দর্শনে যার দ্বারা জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাকে প্রমাণ বলা হয়। এই দিক থেকে যে জিজ্ঞাসাটি উত্থাপিত হয় সেটি হল শব্দ প্রমাণ কিনা? বা শব্দকে অতিরিক্ত বা স্বতন্ত্র প্রমাণ বলা যায় কিনা? এই আলোচনা প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে শব্দকে অতিরিক্ত প্রমাণ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার বিষয়টিকে কেন্দ্র করে ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রামাণ্যকে কেন্দ্র করে মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়। ভারতীয় দর্শনে সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, মীমাংসা, বেদান্ত শব্দকে স্বতন্ত্র প্রমাণরূপে স্বীকার করলেও চার্বাক, বৌদ্ধ, বৈশেষিকগণ শব্দকে স্বতন্ত্র প্রমাণরূপে স্বীকার করেন না। যদিও এ প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে শব্দকে স্বতন্ত্র প্রমাণরূপে স্বীকৃতি না দেওয়ার ক্ষেত্রে তাঁদের যুক্তিশৈলী স্বতন্ত্র। সেক্ষেত্রে তাঁরা শব্দকে স্বতন্ত্র বা অতিরিক্ত প্রমাণরূপে অস্বীকার করে প্রত্যক্ষ বা অনুমানের অন্তর্গত করেছেন। আবার অপরদিকে নৈয়ায়িকগণ শব্দ প্রমাণের স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠাকল্পে পূর্বপক্ষ মত খণ্ডনপূর্বক স্বমত প্রতিষ্ঠা করেছেন স্ব স্ব যুক্তির উপর ভর করে। শব্দ প্রমাণের স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠাকল্পে পূর্বপক্ষ মত খণ্ডনপূর্বক স্বমত প্রতিষ্ঠা ন্যায় দর্শনের নানা গ্রন্থে গুরুত্ব সহকারে আলোচিত হয়েছে।

অপরদিকে শব্দব্যবহারের ক্ষেত্রে পদ কীভাবে নির্দিষ্ট কোনো অর্থকে বোঝাতে সমর্থ? বা একটি অর্থ কীভাবে পদের সঙ্গে সম্বন্ধ যুক্ত? সেবিষয়েও ভারতীয় দর্শনে বিস্তারিত আলোচনা লক্ষ্য করা যায়। শব্দ সম্পর্কীত এই আলোচনা ভারতীয় দর্শনে শব্দের ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনার পরিসরভূক্ত। উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যেতে পারে ভারতীয় দর্শনে শব্দ নানাভাবে নানা আঙ্গিকে আলোচিত হয়েছে যা প্রধানত শব্দ সম্পর্কীত আলোচনা যে একমুখী নয় বহুরূপী ও বহুরৈখিক সেকথাই প্রমাণ করে। নিম্নে শব্দের এই বহুরূপী ও বহুরৈখিক দিকটিকে তুলে ধরার প্রয়াস করা হল।

শব্দচর্চার বহুরূপীতা ও বহুমুখীতাঃ ভারতীয় দর্শনে শব্দ তার বহুরূপ নিয়ে বিরাজ করছে। শব্দের বিভিন্ন দিককে কেন্দ্র করে ভারতীয় দর্শনে শব্দচর্চার ধারা বিস্তার লাভ করেছে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে শব্দকেন্দ্রিক নানা জিজ্ঞাসা ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন দিককে সূচীত করে, যেকথা প্রমাণ করে যে শব্দের আলোচনা ভারতীয় দর্শনে বহুমুখী ও বহুরূপী। শব্দের বহুমুখী ও বহুরূপী দিকটিকে সংক্ষেপে তুলে ধরার জন্য শব্দচর্চা বিষয়ক আলোচনাকে আধিবিদ্যক, জ্ঞানতাত্ত্বিক ও ভাষাতাত্ত্বিক এই তিনটি ধারায় আলোচনা করা যেতে পারে এভাবে।

আধিবিদ্যক ধারা (Meataphysical aspect): শব্দ স্বরূপতঃ কী- এই প্রশ্নটি শব্দচর্চার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। শব্দের স্বরূপ সম্পর্কিত এই প্রশ্নটি দার্শনিকদের বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছে। ভারতীয় দর্শনে শব্দের আধিবিদ্যক ব্যাখ্যায় শব্দ দ্রব্য না গুণ এই বিতর্ককে সামনে রেখে শব্দালোচনার সূচনা পরিলক্ষিত হয়। শব্দ দ্রব্য না গুণ এই বিতর্কটিকে ভারতীয় দর্শনের ন্যায়-বৈশেষিক ও মীমাংসা দর্শন সম্প্রদায় বিশেষ মাত্রা প্রদান করেছে। ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে শব্দ হল আকাশের গুণ। শব্দের লক্ষণে অন্নংভট্ট বলেছেন, “শ্রোত্রগ্রাহ্যো গুণঃ শব্দঃ।। আকাশমাত্রবৃত্তিঃ”।[2] অর্থাৎ, শ্রোত্রেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য গুণ হল শব্দ। এই শব্দ আকাশের বিশেষ গুণ। শব্দের এই আধিবিদ্যক ব্যাখ্যায় ন্যায়- বৈশেষিক দর্শনে সমানতন্ত্র ধারা পরিলক্ষিত হয়। অর্থাৎ, বৈশেষিক মতেও শব্দ আকাশের গুণ। ন্যায়- বৈশেষিক মতে শব্দ আকাশে সমবায় সম্বন্ধে থাকে এবং রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শের মতো শব্দ একটি গুণ। এই শব্দ হল আকাশের গুণ।

অপরদিকে ভাট্ট মীমাংসকগণ যে এগারো প্রকার দ্রব্যের কথা বলেছেন শব্দ তাদের মধ্যে একটি অন্যতম দ্রব্য।[3] ভাট্ট মতে শব্দ নিত্য দ্রব্য। এপ্রসঙ্গে বলা যেতে পারে প্রভাকর মীমাংসকগণ ভাট্ট মতের সঙ্গে একমত নন। তাঁদের মতে শব্দ আকাশের গুণ।[4] প্রভাকর মীমাংসামত খণ্ডনপূর্বক শব্দের দ্রব্যত্ব প্রতিষ্ঠাকল্পে ভাট্ট মীমাংসকগণের যুক্তি হল শব্দ যদি গুণ হত তাহলে শব্দ প্রত্যক্ষকালে শব্দের আশ্রয় আকাশেরও প্রত্যক্ষ হত কিন্তু তা হয় না। কারণ গুণ প্রত্যক্ষকালে গুণ ও তার আশ্রয় দ্রব্য উভয়ের একই সাথে প্রত্যক্ষ হয়। কিন্তু শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা শব্দ প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে শব্দের আশ্রয় আকাশকে কোনো ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ করা যায় না।[5]

শব্দের আধিবিদ্যক আলোচনার আর একটি আলোচ্য বিষয় হল শব্দ নিত্য না অনিত্য এই বিতর্কটি। এই বিতর্কটিকে আলোচ্য বিষয় হিসেবে বিবেচনা করে ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন সম্প্রদায় বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। শব্দ নিত্য না অনিত্য এই আলোচনায় ন্যায়, বৈশেষিক, মীমাংসা, বেদান্ত দর্শন সম্প্রদায়ের মধ্যে মতবিরোধ লক্ষ্য করা যায়। মীমাংসাসূত্রকার মহর্ষি জৈমিনি শব্দের নিত্যত্ব প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যে একাধিক

---

[2] তর্কসংগ্রহ, অন্নংভট্ট, শ্রী নারায়ণ চন্দ্র গোস্বামী কর্তৃক বঙ্গানুবাদ ও অধ্যাপনাসহ, পৃষ্ঠা ২৪৮।

[3] “পৃথিবী সলিলং তেজঃ পবমানস্তমস্তথা। ব্যোমকালদিগাত্মানো মনঃ শব্দ ইতি ক্রমাৎ।।” মানমেয়োদয়, দ্রব্যপ্রকরণম্, নারায়ণ ভট্ট, শ্রী দীননাথ ত্রিপাঠী কর্তৃক অনুদিত পৃষ্ঠা ২৩৭।

[4] “শব্দলক্ষণগুণানুমানসিদ্ধত্বাৎ” প্রকরণপঞ্চিকা তত্ত্বলোক প্রকরণ, মানমেয়োদয়, নারায়ণ ভট্ট, দীননাথ ত্রিপাঠী কর্তৃক অনুদিত, পৃষ্ঠা ৩৩৬।

[5] “তত্র গুণস্য সর্বত্র সাশ্রয়তয়া প্রতীয়মানত্বাদিহ চ নিরাশ্রয়তয়ৈব প্রতীতিদর্শনাৎপ্রত্যক্ষবিরোধীঃ” মানমেয়োদয়, নারায়ণ ভট্ট, দীননাথ ত্রিপাঠী কর্তৃক অনুদিত, পৃষ্ঠা ৩৩৩।

যুক্তির অবতারণা করেছেন। তাঁর মতে শব্দ নিত্য, শব্দের উৎপত্তি বিনাশ রহিত। যেসকল দর্শন সম্প্রদায় শব্দ সংযোগ ও বিভাগের দ্বারা উৎপন্ন হয় বলে মনে করেন তাঁদের বিরুদ্ধে তিনি বলেন শব্দ সংযোগ ও বিভাগের দ্বারা উৎপন্ন হয় না বরং তা অভিব্যক্ত হয়। তাঁর মতে শব্দকে নতুন সৃষ্টি বলা যায় না। এপ্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য হল উচ্চারণের পূর্বে শব্দ থাকে বলেই বক্তা তা উচ্চারণ করতে পারে। বক্তা সেই পূর্বস্থিত শব্দকে তাঁর অভিনব প্রচেষ্টার দ্বারা প্রকাশ বা ব্যক্ত করছেন মাত্র। তিনি নতুন কিছু সৃষ্টি করছেন না। বক্তার উচ্চারণের ফলে শব্দের অভিব্যক্তি ঘটে মাত্র। শব্দ পূর্ব থেকেই স্থিত এবং অপ্রকাশিত অবস্থায় ছিল, বক্তার উচ্চারণের ফলে তা প্রকাশিত হল কিন্তু তা বলে শব্দ সৃষ্ট হল একথা বলা যায় না। উচ্চারণের পূর্বেই শব্দের অস্তিত্ব আছে। আমরা প্রচেষ্টার মাধ্যমে শব্দ উচ্চারণ করি, শব্দ সৃষ্টি করতে পারি না। শব্দের নিত্যত্ব প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যে মহর্ষি জৈমিনি বলেছেন, "বর্ণান্তরমবিকারঃ"।[6] অর্থাৎ, শব্দের বিকার নেই। শব্দের উৎপত্তি বা বিনাশ যেমন নেই তেমনই শব্দের পরিবর্তনও নেই। বক্তা ভুলবশতঃ বা বিকারবশতঃ শব্দের আকৃতির পরিবর্তন ঘটায়। বলা যেতে পারে শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে সঠিক শব্দের পরিবর্তে ভুল শব্দ প্রয়োগ শব্দের পরিবর্তনকে সূচিত করে না। তা বক্তার ভুল বলেই গৃহীত হয়। সুতরাং শব্দের আকৃতির পরিবর্তন হয় বলে শব্দ অনিত্য এই মত মহর্ষি জৈমিনি খণ্ডন করেছেন।

শব্দের নিত্যত্ব প্রতিপাদন আলোচনা প্রসঙ্গে মানমেয়োদয়কার নারায়ণভট্টের কথা বলা যেতে পারে। তিনি তাঁর মানমেয়োদয় গ্রন্থে শব্দের উৎপত্তির পরিবর্তে অভিব্যক্তির কথা বলেছেন। তাঁর মতে কণ্ঠ ও তালুর অভিঘাতের ফলে শব্দের উৎপত্তি হয় না তা অভিব্যক্ত হয় মাত্র। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, মাটি খননের ফলে জলের দেখা পাওয়া অভিব্যক্তিস্বরূপ, জল পূর্বেই বিদ্যমান ছিল, খনন সেই জলের কারণ নয়। সেরূপ কণ্ঠ ও তালুর অভিঘাতের ফলে শব্দের উৎপত্তি হয় না প্রকাশিত হয় মাত্র।[7] আবার একথাও বলা যেতে পারে শব্দকে অনিত্য বললে বেদকে নিত্য বলা যাবে না। কারণ অনিত্য শব্দাত্মক বেদ কখনো নিত্য হতে পারে না। কারণ বেদ শব্দাত্মক এবং নিত্য।

অপরদিকে ন্যায়-বৈশেষিক দার্শনিকগণ শব্দকে অনিত্য বলে দাবী করেন। শব্দের অনিত্যতা প্রতিষ্ঠাকল্পে মহর্ষি গৌতম তাঁর ন্যায়সূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহ্নিকের ত্রয়োদশ সূত্রে বলেছেন, "আদিমত্ত্বাদৈন্দ্রিয়কত্বাৎ কৃতকবদুপচারাচ্চ"।[8] মহর্ষি গৌতম উক্ত সূত্রে শব্দের অনিত্যত্ব প্রতিষ্ঠাকল্পে তিনটি হেতুর উল্লেখ করেছেন। এই হেতুগুলি হল উৎপত্তিমত্ততা, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যত্ব এবং কৃতকত্ব। সূত্রকারের বক্তব্য অনিত্য সুখদুঃখাদির ব্যবহারহেতু শব্দ অনিত্য। শব্দের উৎপত্তি ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন তাঁর ভাষ্যে "উৎপত্তিধর্মকত্ত্বাৎ" ও "ভূত্বা ন ভবতি"[9] এই দুটি বাক্যের ব্যবহার করেছেন। যার মধ্য দিয়ে ভাষ্যকার শব্দকে বিনাশধর্মক বলে শব্দের অনিত্যতা প্রতিপাদন করেছেন। এপ্রসঙ্গে বলা যেতে পারে নৈয়ায়িকগণ শব্দের উৎপত্তি প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বীচিতরঙ্গন্যায় ও কদম্বকোরকন্যায় প্রভৃতি যুক্তির অবতারণা করেছেন। নব্যনৈয়ায়িক বিশ্বনাথ শব্দের উৎপত্তি প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন, শান্ত জলাশয়ে ঢিল ছুঁড়লে তরঙ্গের সৃষ্টি হয় এবং সেই তরঙ্গ থেকে আবার তরঙ্গের উৎপত্তি হয়। শব্দও সেরূপ কোনো

---

[6] জৈমিনিসূত্র, ১/১/১৬, মহর্ষি জৈমিনি, ভূতনাথ সপ্ততীর্থ কর্তৃক বঙ্গানুবাদসহ,পৃষ্ঠা ৩৮।

[7] মানমেয়োদয়, নারায়ণ ভট্ট, দীননাথ ত্রিপাঠী কর্তৃক অনুদিত, পৃষ্ঠা ৩৪০।

[8] ন্যায়সূত্র, ২/২/১৩ মহর্ষি গৌতম, ন্যায়দর্শন, ফণিভূষণ তর্কবাগীশ কর্তৃক বঙ্গানুবাদসহ,পৃষ্ঠা ৩৯৩।

[9] ন্যায়ভাষ্য, বাৎস্যায়ন, ন্যায়দর্শন, ফণিভূষণ তর্কবাগীশ কর্তৃক বঙ্গানুবাদসহ,পৃষ্ঠা ৩৯৪।

মৃদঙ্গাদিতে দণ্ডের সহযোগে উৎপন্ন হয় এবং শব্দ থেকে শব্দান্তর উৎপন্ন করে। বিশ্বনাথ শব্দের উৎপত্তি প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কদম্বকোরকন্যায় প্রক্রিয়ারও উল্লেখ করেছেন।[10]

জ্ঞানতাত্ত্বিক ধারা (Epistemological aspect): শব্দের জ্ঞানতাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় যে বিতর্কটি খুব গুরুত্বপূর্ণ তা হল শব্দের জ্ঞানোৎপাদন সামর্থ্য আছে না নেই? এই বিতর্কটি প্রধানত শব্দের অতিরিক্ত বা স্বতন্ত্র প্রামাণরূপে স্বীকৃতি দেওয়া বা না দেওয়াকে কেন্দ্র করে উপস্থাপিত হয়েছে। শব্দের প্রামাণ্যকেন্দ্রিক আলোচনায় সকল ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায় একমত পোষণ করেন। তবে শব্দ প্রমাণের স্বাতন্ত্র্য বিষয়ক আলোচনায় ভারতীয় দর্শনে মত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এই আলোচনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিকটি হল শব্দ প্রমাণের স্বাতন্ত্র্য বিষয়ক আলোচনায় ন্যায় বৈশেষিক দর্শনের অবস্থান। সমানতন্ত্র দর্শন হয়েও ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শন সম্প্রদায় শব্দ প্রমাণের স্বাতন্ত্র্য বিষয়ক আলোচনায় একমত নয়। বৈশেষিক দর্শন সম্প্রদায় শব্দকে স্বতন্ত্র প্রমাণরূপে স্বীকৃতি না দিয়ে অনুমানের অন্তর্গত করেছেন। শব্দকে অনুমানের কুক্ষিগত করার ক্ষেত্রে বৈশেষিকগণের যুক্তিটি এরকম – "শব্দকে পক্ষ করে অর্থের অনুমান হয়"। বৈশেষিকগণ শাব্দবোধকে প্রমারূপে স্বীকৃতি দিলেও তার করণরূপে শব্দকে স্বতন্ত্র প্রমাণের মর্যাদা দেন নি। তাঁরা শব্দজন্য যে শব্দার্থবোধ তাকে অনুমিতি বিশেষ বলে মনে করেন। এপ্রসঙ্গে প্রশস্তপাদার্য তাঁর ভাষ্যে শব্দ ও অনুমানকে সমানবিধিবৎ রূপে ব্যাখ্যা করেছেন।[11]

অপরদিকে নৈয়ায়িকগণ শব্দ প্রমাণের স্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী। ন্যায়সূত্রকার মহর্ষি গৌতম তাঁর ন্যায়সূত্রে শব্দপ্রমাণের অতিরিক্ত প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠার পূর্বে পূর্বপক্ষী মত খণ্ডন পূর্বক শব্দপ্রমাণের অতিরিক্ত প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াস করেছেন। তিনি তাঁর ন্যায়সূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ে ঊনপঞ্চাশ সংখ্যক সূত্র থেকে ছাপান্ন সংখ্যক সূত্রে শব্দ প্রমাণের স্বাতন্ত্র্য বিষয়ে পূর্বপক্ষ মত উপস্থাপন করে তা খণ্ডনপূর্বক শব্দ প্রমাণের স্বাতন্ত্র্য বিষয়ক স্বমত প্রতিষ্ঠা করেছেন। ন্যায়সূত্রকার মহর্ষি গৌতম তাঁর ন্যায়সূত্রের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকের সপ্তম সূত্রে আপ্তের উপদেশকেই শব্দ প্রমাণ বলেছেন। ভাসর্বজ্ঞ, কেশব মিশ্র, জয়ন্ত ভট্ট, জগদীশ তর্কালঙ্ককার প্রমুখ নৈয়ায়িকগণ তাঁদের স্ব স্ব গ্রন্থে শব্দ প্রমাণের স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠাকল্পে মহর্ষি গৌতমের অনুসারী হয়েছেন।

ভাষাতাত্ত্বিক ধারা (Linguistic aspect): বর্তমান প্রসঙ্গে শব্দালোচনা বিষয়ক আলোচনায় শব্দের ভাষাতাত্ত্বিক দিকটি আলোচিত হবে প্রধানত দুটি ধারায়। একটি হল ব্যাকরণ দার্শনিক পতঞ্জলিকৃত মহাভাষ্যের পস্পশাহ্নিক অনুসণে এবং অপরটি হবে নৈয়ায়িক বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চাননের ভাষাপরিচ্ছেদ ও সিদ্ধান্তমুক্তাবলী টীকা অনুসরণ করে। এপ্রসঙ্গে বলা যেতে পারে শব্দের ভাষাতাত্ত্বিক দিকটি ঋকবৈদিক যুগ থেকে শুরু করে ব্যাকরণ দর্শনের হাত ধরে অগ্রসর হয়েছে এবং ঋক বৈদিক যুগে এই শব্দচর্চা যা বাক্‌চর্চা নামেই অভিহিত ছিল তার চারটি রূপ। প্রথম তিনটি অব্যক্ত এবং চতুর্থটি ব্যক্ত। বৈয়াকরণ দার্শনিকগণ অব্যক্ত বাক্ এর তিনটি রূপের কথা বলেছেন। যা পরা, পশ্যন্তী ও মধ্যমা নামে পরিচিত আর ব্যক্ত রূপটি বৈখরী নামে অভিহিত। তবে সকলেই যে বাক্-এর এই চারটি রূপকে স্বীকার করেছেন তা নয়। এবিষয়ে বৈয়াকরণগণের মধ্যে মত পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। ভর্তৃহরি ও নাগেশের মতামত এবিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলেও

[10] ভাষাপরিচ্ছেদ, কারিকা ১৬৬, বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন, পঞ্চানন শাস্ত্রী কর্তৃক অনুবাদ, পৃষ্ঠা ৫৮৮।

[11] প্রশস্তপাদভাষ্য, প্রশস্থপাদ, ব্রহ্মচারী মেধাচৈতন্য কর্তৃক অনুবাদ থেকে উদ্ধৃত, পৃষ্ঠা ৩৫৭ ।

বাহুল্য বর্জনের তাগিদে শব্দের ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনায় বৈয়াকরণ পতঞ্জলির মতামতকে অনুসরণ করেই আলোচনা অগ্রসর হয়েছে।

পতঞ্জলির মহাভাষ্যের পস্পশাহ্নিকে বলা হয়েছে ‘‘প্রতীতপদার্থকো লোকে ধ্বনিঃ শব্দ ইত্যুচ্যতে’’[12] অর্থাৎ, যে ধ্বনি লোকসাধারণের অর্থপ্রতীতি ঘটায় তাই শব্দ। পতঞ্জলির মতে ধ্বনি বিশেষই শব্দ। আবার মহাভাষ্যের পস্পশাহ্নিকে শব্দের লক্ষণে বলা হয়েছে ‘‘শ্রোত্রোপলব্ধিবুদ্ধিনির্গ্রাহ্যপ্রয়োগেনাভিজ্বলিতঃ আকাশদেশঃ শব্দঃ’’।[13] এখানে শ্রোত্রোপলব্ধি হল শ্রবণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য আর আকাশ দেশ বলতে বোঝানো হয়েছে আকাশে আশ্রিত। শ্রবণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও আকাশাশ্রিত ধ্বন্যাত্মক শব্দই এখানে বিবেচিত হয়েছে। শব্দের লক্ষণে পস্পশাহ্নিকে একথাও বলা হয়েছে ‘‘যেনোচ্চারিতেন সাস্না লাঙ্গূল-খুর-বিষাণিনাং সম্প্রত্যয়ো ভবতি স শব্দঃ’’।[14] অর্থাৎ, যা উচ্চারণ করলে সাস্নালাঙ্গূলাদি বিশিষ্ট প্রাণী বিশেষের জ্ঞান জন্মে তাই শব্দ।

আবার মহাভাষ্যের পস্পশাহ্নিকে পতঞ্জলি একটি প্রশ্নের মাধ্যমে শব্দের স্বরূপ প্রকাশ করতে একটি প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন এভাবে, “অথ গৌরিত্যত্র কঃ শব্দঃ?” এই প্রশ্নের উত্তর প্রসঙ্গে চারটি বিকল্পের কথা বলেছেন। এই বিকল্পগুলির প্রথমটি হল, গলকম্বল, লাঙ্গুল, খুর, শৃঙ্গ প্রভৃতি যুক্ত প্রাণীটি কী ‘গো’ শব্দ, দ্বিতীয় বিকল্পটি হল, প্রাণীটির চলাফেরা ইত্যাদি কি ‘গো’ শব্দবাচক, তৃতীয় বিকল্পটি হল, উক্ত প্রাণীটির বর্ণ কী ‘গো’ শব্দবাচক আর চতুর্থ বিকল্পটি হল, ‘গো’ জাতীয় বিশেষ প্রাণীটি মারা গেলেও কী ‘গো’ শব্দটির কোন অস্তিত্ব থাকে। অর্থাৎ, মূল প্রশ্নটি হল কোন্ টিকে ‘গো’ শব্দ দিয়ে বুঝবো? উক্ত প্রশ্নগুলির আড়ালে যে সমস্যাটির অবতারণা ও তার সমাধান পতঞ্জলি দিয়েছেন তা হল প্রথম বিকল্পটিকে শব্দ বলা যায় না, কেননা গলকম্বল, লাঙ্গুল যুক্ত প্রাণীটি হল একটি দ্রব্য, দ্বিতীয় বিকল্পটিকেও শব্দ বলা যায় না কারণ ওই প্রাণীটির যে বৈশিষ্ট্যের কথা সেখানে বলা হয়েছে তা আসলে একটি কর্ম বা ক্রিয়া, তৃতীয় বিকল্পটিও শব্দ নয় কারণ তা স্পষ্টতঃই দ্রব্যের গুণ। চতুর্থ বিকল্পটিকেও শব্দ বলা যাবে না কারণ তা সাধারণ ধর্ম রূপে দ্রব্যের জাতিকে নির্দেশ করে। সেকারণেই পতঞ্জলি পস্পশাহ্নিকের চতুর্থ সূত্রে উক্ত সমস্যার সমাধানে বলেছেন ‘‘যেনোচ্চারিতেন সাস্না লাঙ্গূল-খুর-বিষাণিনাং সম্প্রত্যয়ো ভবতি স শব্দঃ’’।[15] অর্থাৎ যা উচ্চারণ করলে সাস্নালাঙ্গূলাদিবিশিষ্ট প্রাণী বিশেষের জ্ঞান জন্মে তাই শব্দ। অনুরূপভাবে যা উচ্চারিত হলে দ্রব্যাদি পদার্থ বোধিত হয় তাই ‘দ্রব্যাদি’ শব্দ।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে শব্দচর্চার ভাষাতাত্ত্বিক দিকটির আর একটি বিশেষ আলোচ্য বিষয় হল বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চাননের ভাষাপরিচ্ছেদ ও সিদ্ধান্তমুক্তাবলী টীকা অনুসরণ করে শব্দ বিষয়ক আলোচনা। এই আলোচনায় মূলত শব্দার্থ নিরূপণে শব্দার্থসম্বন্ধ হিসেবে বৃত্তি এবং শাব্দবোধ বা বাক্যার্থ নিরূপণে আকাঙ্ক্ষা, যোগ্যতা, আসত্তি ও তাৎপর্য বিষয়ক আলোচনা প্রধান আলোচ্য বিষয় হিসেবে স্থান পেয়েছে। বিশ্বনাথ বৃত্তি বলতে পদ ও পদার্থের সম্বন্ধকে বুঝিয়েছেন। তিনি ভাষাপরিচ্ছেদ ও সিদ্ধান্তমুক্তাবলী টীকায় বৃত্তি নিয়ে আলোচনা করেছেন। শাব্দবোধের অনুকূল সম্বন্ধ হিসেবে বৃত্তি বিষয়ে বিশ্বনাথের মত হল বৃত্তি শক্তি ও

---

[12] মহাভাষ্য, পস্পশাহ্নিক,পতঞ্জলি, শব্দতত্ত্ব, রবীন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য থেকে উদ্ধৃত, পৃষ্ঠা ১৩।

[13] মহাভাষ্য (অনুদিৎসূত্র-ভাষ্য), পতঞ্জলি, শব্দতত্ত্ব, রবীন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য থেকে উদ্ধৃত, পৃষ্ঠা ৪৮।

[14] মহাভাষ্য, পস্পশাহ্নিক,পতঞ্জলি, শব্দতত্ত্ব, রবীন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য থেকে উদ্ধৃত, পৃষ্ঠা ১৩।

[15] মহাভাষ্য, পস্পশাহ্নিক,পতঞ্জলি, শব্দতত্ত্ব, রবীন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য থেকে উদ্ধৃত, পৃষ্ঠা ১৩।

লক্ষণার মধ্যস্থিত একপ্রকার সম্বন্ধ। তাঁর মতে এক সম্বন্ধীর জ্ঞান ব্যতীত অন্য সম্বন্ধীর জ্ঞান হয়না। বলা যেতে পারে বৃত্তি নামক সম্বন্ধবিশিষ্ট পদার্থ শাব্দবোধের বিষয়রূপে গৃহীত হয়, যদি তা না হতো তাহলে 'ঘট' পদের জ্ঞান স্থলে সমবায় সম্বন্ধে আকাশেরও জ্ঞান হয়ে যেত। কারণ 'ঘট' পদ আকাশ নামক দ্রব্যে সমবায় সম্বন্ধে থাকে, সেক্ষেত্রে উক্ত সমবায় সম্বন্ধের এক সম্বন্ধী যদি পদ হয়, তাহলে অপর সম্বন্ধী আকাশ। ফলতঃ 'ঘট' পদ শোনার পর অপর সম্বন্ধী আকাশও উপস্থিত হয়ে যাবে, ফলতঃ আকাশ শাব্দবোধের বিষয় হয়ে যাবে। কিন্তু, আকাশ অন্য পদার্থ বাচক, এবং সেক্ষেত্রে পদের বৃত্তি প্রতিপাদিত না হওয়ায় তা শাব্দবোধের বিষয় হয়ও না। কোন পদ শ্রবণের পর বৃত্তি সম্বন্ধকে আশ্রয় করেই পদার্থ অপর সম্বন্ধীরূপে উপস্থিত হলে তবে শাব্দবোধ হয়। তিনি ভাষাপরিচ্ছেদে শক্তিকে শাব্দবোধের সহকারী কারণ নির্দেশ করতে বলেছেন,

> "পদজ্ঞানন্তু করণং দ্বারং তত্র পদার্থধীঃ
> শাব্দবোধঃ ফলং তত্র শক্তিধীঃ সহকারিণী"।[16]

শক্তির জ্ঞান শাব্দবোধের সহকারী কারণ। বিশ্বনাথ ভাষাপরিচ্ছেদে শক্তিকেই শাব্দবোধের সহকারী কারণ বলেছেন এবং শক্তির মতোই লক্ষণাও যে শাব্দবোধের সহকারী কারণ সেবিষয়ে মত প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে শক্তি হল মুখ্য বৃত্তি এবং লক্ষণা হল গৌণ বৃত্তি।

ভাষাপরিচ্ছেদে পদার্থসমূহের পরস্পর অন্বয়বোধকরূপে শাব্দবোধের বা বাক্যার্থবোধের সহকারী কারণ হিসেবে আসত্তিজ্ঞান, যোগ্যতাজ্ঞান, আকাঙ্ক্ষাজ্ঞান এবং তাৎপর্যজ্ঞানের কথা বলা হয়েছে। মুক্তাবলীটীকায় বিশ্বনাথ বলেছেন, "আসত্তিজ্ঞানং যোগ্যতাজ্ঞানম্ আকাঙ্ক্ষাজ্ঞানং তাৎপর্য্যজ্ঞানঞ্চ শাব্দবোধে কারণম্"।[17] অর্থাৎ, আসত্তি-সন্নিধিজ্ঞান, যোগ্যতা জ্ঞান, আকাঙ্ক্ষাজ্ঞান ও তাৎপর্যজ্ঞান শাব্দবোধের কারণ রূপে অভিহিত হয়। বিশ্বনাথ শাব্দবোধের বা বাক্যার্থবোধের অন্যতম কারণ রূপে আসত্তি সম্বন্ধে বলেছেন ''তত্রাসত্তিপদার্থমাহ—সন্নিধানন্ত্বিতি''।[18] এখানে 'আসত্তি' পদের দ্বারা সন্নিধানকে বোঝানো হয়েছে। তিনি বলেছেন আসত্তি জ্ঞানের ন্যায় যোগ্যতার জ্ঞানও শাব্দবোধের অন্যতম কারণ। তাঁর মতে, "পদার্থে তত্র তদ্বত্তা যোগ্যতা পরিকীর্ত্তিতা"।[19] পদের সাথে পদের সম্বন্ধ হল যোগ্যতা। উদাহরণ দিয়ে বলা যেতে পারে ''বহ্নিনা সিঞ্চতি'' এই বাক্যে যোগ্যতা জ্ঞানের অভাববশতঃ শাব্দবোধ হয় না। কেননা, জলের দ্বারা সেচনক্রিয়া সম্ভব, বহ্নির দ্বারা নয়। উক্ত বাক্যটিতে যোগ্যতা জ্ঞানের অভাব থাকার করণে শাব্দবোধ অসম্ভব। আকাঙ্ক্ষার স্বরূপ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বিশ্বনাথ বলেছেন "যৎপদেন বিনা যস্যাঽননুভাবকতা ভবেৎ"।[20] অর্থাৎ, এ কথা বুঝতে হবে যে, যে পদ ছাড়া যে পদ শাব্দবোধের জনক হতে পারেনা, সেই পদের সঙ্গে সেই পদের আকাঙ্ক্ষা আছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে ''চৈত্রো গচ্ছতি'' এই পদ দুটি পরস্পর সাকাঙ্ক্ষ। কারণ 'গচ্ছতি' পদ শ্রবণকালে আকাঙ্ক্ষা জন্মে এবং প্রশ্ন হয় "কো গচ্ছতি?'' আমাদের আকাঙ্ক্ষার নিরসন হয়

---

[16] ভাষাপরিচ্ছেদ, কারিকা ৮১, বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন, পঞ্চানন শাস্ত্রী অনুদিত, পৃষ্ঠা ৪১১।

[17] সিদ্ধান্তমুক্তাবলী, বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন, পঞ্চানন শাস্ত্রী অনুদিত, পৃষ্ঠা ৪৬৪।

[18] ভাষাপরিচ্ছেদ, কারিকা ৮২, বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন, পঞ্চানন শাস্ত্রী অনুদিত,পৃষ্ঠা ৪৬৪।

[19] ভাষাপরিচ্ছেদ, কারিকা ৮৩, বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন, পঞ্চানন শাস্ত্রী অনুদিত,পৃষ্ঠা ৪৭০।

[20] ভাষাপরিচ্ছেদ, কারিকা ৮৪, বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন, পঞ্চানন শাস্ত্রী অনুদিত,পৃষ্ঠা ৪৭২।

'চৈত্রো' পদটির দ্বারা। সুতরাং এখানে 'চৈত্রো' এবং 'গচ্ছতি' পদ দুটি আকাঙ্ক্ষা যুক্ত। ভাষাপরিচ্ছেদে তাৎপর্যের লক্ষণ করা হয়েছে ''বক্তুরিচ্ছা তু তাৎপর্য্যং পরিকীর্ত্তিতম্''।[21] যার অর্থ হল বক্তার ইচ্ছাই তাৎপর্য। শাব্দবোধ বা বাক্যার্থবোধের ক্ষেত্রে বক্তার ইচ্ছার উপলব্ধি প্রয়োজন, না হলে বক্তার বক্তব্য বা বিবক্ষিত অর্থ শ্রোতার কাছে অস্পষ্ট থেকে যাবে।

শব্দচর্চার দার্শনিক বিশ্লেষণের উপর ভর করে উপরিউক্ত যে আলোচনা পাওয়া গেল তার থেকে একথা প্রমাণিত হয় যে শব্দচর্চা যেমন বহুমুখী, বহুরূপী তেমনই সুগভীর। এই আলোচনায় শব্দকেন্দ্রিক নানা আধিবিদ্যক জিজ্ঞাসা, জ্ঞানতাত্ত্বিক জিজ্ঞাসা এবং নানা ভাষাতাত্ত্বিক জিজ্ঞাসা শব্দচর্চার ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। এছাড়াও শব্দ সম্পর্কিত নানা জিজ্ঞাসা, বিতর্ক, শব্দকেন্দ্রিক আলোচনায় ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়গুলির মধ্যে যে যে বিষয়ে মতৈক্য বা মতানৈক্য আছে সেই দিকগুলিও এই আলোচনাকে সমৃদ্ধ করেছে। শব্দ সম্পর্কীত নানা জটিল সমস্যা যেমন দ্রব্য বা গুণরূপে, নিত্য বা অনিত্যরূপে, স্বতন্ত্র প্রমাণ রূপে স্বীকৃতি বা অস্বীকৃতি বিষয়ক প্রশ্নগুলি শব্দসম্পর্কীত নানাবিধ ব্যাখ্যা শব্দচর্চার নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে। বলা যেতে পারে এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধটি উক্ত ব্যাখ্যারই সংক্ষিপ্ত সমীক্ষা বা বিশ্লেষণাত্মক আলোচনার ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রয়াস মাত্র।

গ্রন্থপঞ্জী:

১। কর, গঙ্গাধর: শব্দার্থসম্বন্ধসমীক্ষা, সংস্কৃত বুক ডিপো, (২০০৩)।
২। ঘোষ, দীপক কুমার: ভাষাপরিচ্ছেদসমীক্ষা, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, (২০০৩)।
৩। জৈমিনিসূত্র, মহর্ষি জৈমিনি: মীমাংসা-দর্শনম, পন্ডিত ভূতনাথ সপ্ততীর্থ কর্তৃক সম্পাদিত, সংস্কৃত বুক ডিপো, (১৪১৬)।
৪। তর্কসংগ্রহ ও তর্কসংগ্রহ দীপিকা, অন্নমভট্ট: নারায়ণ চন্দ্র গোস্বামী কর্তৃক বঙ্গানুবাদ ও বিবৃতি সহ, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, (১৩৯০ বঙ্গাব্দ)।
৫। দাস, করুণাসিন্ধু: প্রাচীন ভারতের ভাষাদর্শন, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, (২০১১)।
৬। ন্যায়সূত্র (গৌতমসূত্র) ও বাৎস্যায়নভাষ্য সহ: ন্যায়দর্শন, ফণিভূষণ তর্কবাগীশ কর্তৃক বঙ্গানুবাদ ও বিবৃতি সহ (১ম, ২য় ও ৩য় খন্ড), পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্যদ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, (২০০০)।
৭। প্রশস্তপাদভাষ্যম্, প্রশস্তপাদাচার্য: দন্ডীস্বামী দামোদর আশ্রম কর্তৃক সম্পাদিত ভাষ্যবিবৃতি ও বিবরণসহ, দামোদর আশ্রম (১ম ও ২য় খন্ড), (২০১৭)।
৮। বাক্যপদীয়, ভর্তৃহরি: বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য কর্তৃক সম্পাদিত (১ম ও ২য় খণ্ড) পশ্চিমবঙ্গরাজ্য পুস্তক পর্ষদ, (২০০৭)।
৯। বাক্যপদীয়, ভর্তৃহরি: মৃণালকান্তি গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক বঙ্গানুবাদ (ব্রহ্মকাণ্ড), (২০১৮)।

[21] ঐ, পৃষ্ঠা ৪৭৩।

১০। ব্যাকরণ মহাভাষ্য, পস্পশাহ্নিক ,মহর্ষি পতঞ্জলি : দণ্ডিস্বামী দামোদর আশ্রম কর্তৃক অনূদিত (চতুর্থ প্রকাশ- ১৪১৭)।
১১। ভট্টাচার্য, সুখময়: পূর্বমীমাংসা দর্শন, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, (১৯৮৩)।
১২। ভাষাপরিচ্ছেদ, বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন: পঞ্চানন শাস্ত্রী কর্তৃক বঙ্গানুবাদ সহ, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, (১৩৭৭ বঙ্গাব্দ)।
১৩। মন্ডল, প্রদ্যোত কুমার: ভারতীয় দর্শন, প্রগতিশীলপ্রকাশন, দ্বিতীয়সংস্করণ, (২০০৮)।
১৪। মণ্ডল, নীলিমা: শাব্দবোধে ব্যুৎপত্তিবাদ প্রসঙ্গ, শরৎ বুক ডিস্ট্রিবিউটর, (২০০৩)।
১৫। হালদার, গুরুপদ: ব্যাকরণ দর্শনের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, (১৯৪৫)।